ভারত-মসনদে নরেন্দ্র মোদি ঃ নতুন চেহারায় ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ

গত ৭ এপ্রিল থেকে ১২ মে,'১৪, মাসব্যাপী ভারতের ১৬-তম লোকসভা নির্বাচনে হিন্দু মৌলবাদী পার্টি বিজেপির কাছে ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়েছে। ৫৪৩টি সংসদীয় আসনের মধ্যে বিজেপি পেয়েছে ২৮৩টি এবং কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ৪৪টি। ভারতীয় লোকসভায় এককভাবে সরকার গঠন করতে লাগে ২৭২টি আসন। বিজেপি তার থেকে ১১টি আসন বেশী পেয়েছে। আর ইউপিএ জোট পেয়েছে মাত্র ৫৮টি।

৬০ বছর ধরে ভারতীয় রাজনীতিতে আধিপত্যকারী ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেসের অসম্মানজনক পরাজয় এবং হিন্দু মৌলবাদী উগ্র সাম্প্রদায়িক বিজেপি'র উত্থানের কারণ কি? এর কারণ বুর্জোয়া শাসকশ্রেণির সংকটের মধ্যেই নিহিত।

ভারতীয় শাসকশ্রেণির যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল তার কারণ তাদের শোষণমূলক শাসনব্যবস্থা। কয়লা-বিদ্যুৎ এবং কমনওয়েলথ গেমসের হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির সমালোচনার ঝড় উঠেছিল সারা ভারত জুড়ে। এ কারণে আন্না হাজারের দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন এবং এর থেকে গজিয়ে উঠেছে আমআদমি পার্টি ও তার নেতা কেজরিওয়াল। ভারতের বুর্জোয়া মিডিয়া যে প্রবৃদ্ধি উন্নয়নের প্রচার করে থাকে তা হলো ভারতের প্রখ্যাত লেখিকা অরুন্ধতি রায়-এর ভাষায় "সব কিছুকে ব্যক্তিমালিকানায় নিয়ে আসার ফলে ভারতকে বিশ্বের অন্যতম দ্রুত প্রবৃদ্ধিশীল অর্থনীতির একটিতে পরিণত করেছে। যে কোনও পুরনো ধাচের উপনিবেশের মতোই ভারতের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যিক পণ্য খনিজ দ্রব্য। ভারতের নতুন সব মেগা করপোরেশন যেমন–টাটা, জিন্দাল, এসার, রিলায়েন্স, স্টারলিট তারাই যারা নিজের পেশি শক্তি দিয়ে মাটির গভীর থেকে টাকা তুলে আনছে।.....ভারতের কোটি কোটি মানুষের জমি রাষ্ট্র দখল করে 'জনস্বার্থে' তুলে দিচ্ছে বৃহৎ করপোরেশনের হাতে। ২০ বছরের বিশাল প্রবৃদ্ধির পর ভারতের মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৬০ ভাগ আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেঁচে আছে। শতকরা ৯০ ভাগ শ্রমিক কাজ করছে অসংগঠিত খাতে।" (অরুন্ধতি রায়, ক্যাপিটালিজম এ ঘোস্ট স্টোরি, আউটলুক, ২৬ মার্চ ২০১২)।

সুতরাং ভারতের অর্থনীতির এই বিশাল প্রবৃদ্ধি হচ্ছে মূলতঃ কর্পোরেট বৃহৎ বুর্জোয়াদের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি। যাতে শ্রমিক-কৃষক সাধারণ জনগণের কোন অংশীদারিত্ব নেই, তার সুফলও তারা ভোগ করেন না। বরং ৯০ ভাগ শ্রমিক করপোরেট ব্যবসায়ীদের শোষণের যাতাকলে নিষ্পেশিত। লক্ষ লক্ষ কৃষক জমি হারা। গত কয়েক বছরে ঋণগ্রস্থ হয়ে ভারতে ২ লক্ষ কৃষক আত্মহত্যা করেছে। খুন-ধর্ষণ, গণধর্ষণ সর্বত্র। উত্তর-পূর্ব ভারতের সাতটি রাজ্যের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার তথা জাতিগত আন্দোলনকে দমন করতে কয়েক লক্ষ সেনাবাহিনী খুন-ধর্ষণ নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। মনিপুরের প্রতিবাদী সাহসী নারীরা ভারতীয় সেনাদের দ্বারা ধর্ষণ-নিগ্রহের প্রতিবাদে একাধিকবার রাজপথে নগ্ন মিছিল করেছেন।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির কারণে দরিদ্র ও সাধারণ জনগণের ক্রয়ক্ষমতা সাধ্যের বাইরে চলে গেছে। বিবিধ সামাজিক কর্মসূচির নামে কোটি কোটি টাকা রাজভান্ডার থেকে ব্যয় হয়েছে ঠিকই। কিন্তু তার সুফল জনগণের ভাগ্যে জোটেনি। কংগ্রেসের নেতারা তা লুটে পুটে খেয়েছে। ভারতে মাওবাদী অধ্যুষিত এলাকায় তাদের দ্বারা চালিত জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামে জনগণের উত্থান এবং তাদের উপর চালিত বর্বরোচিত দমনাভিযানকে বাদ দিলেও উপরোক্ত শোষণ-নির্যাতনের কারণে বিশাল ভারতের সাধারণ জনগণ শাসকশ্রেণির উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। জনগণ বুঝে বুর্জোয়া পার্টিগুলো জনগণের স্বার্থের কথা বলে ক্ষমতায় যায়। এরা সকলেই নির্মমভাবে জনগণকে শোষণ করে, ফ্যাসিবাদী দমন চালায়। দুর্নীতি-লুটপাট-জালিয়াতি করে অর্থসম্পদের পাহাড় গড়ে। এরা সকলেই ভারতীয় শাসকশ্রেণি ও সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষা করে। এদের রাজনীতি, গণতন্ত্র, ক্ষমতা, রাষ্ট্র, সংসদ, আইন-আদালত, সশস্ত্র বাহিনী সবাই জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে এবং শাসকশ্রেণি ও সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে।

ভারতীয় শাসকশ্রেণি উপরোক্ত সংকট থেকে উত্তরণের পথ হিসেবেই ধর্মীয় মৌলবাদকে কাজে লাগিয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা আর ধর্মীয় মৌলবাদ একটি বিপরীতধর্মী দর্শন। ধর্মনিরপেক্ষতা একটি প্রগতিশীল বিষয়। বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীলরা একে লুফে নিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার শ্লোগানের আড়ালে শোষণ ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করার জন্য। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও দালাল শাসকশ্রেণি ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ধর্মান্ধতা দুটো অস্ত্রই তাদের ভান্ডারে মজুদ রাখে। এ কারণেই বাংলাদেশে যেমন ধর্মনিরপেক্ষ নামধারী বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়াশীল আওয়ামী লীগ আছে, তেমনি আছে ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠন জামাতসহ অন্যান্য মৌলবাদী সংগঠন এবং তাদের সাথে জোটবাধা বিএনপি। ভারতেও তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেসের বিপরীতে আছে ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠন বিজেপি। সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের বুর্জোয়া দালাল শাসকশ্রেণি তাদের শাসন ব্যবস্থার সংকট দেখা দিলে উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত অস্ত্রটি ব্যবহার করে। তার প্রমাণ ২০০২ সালে দাঙ্গায় মুসলিম হত্যাযজ্ঞ চালানোর কারণে মোদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিষিদ্ধ করেছিল এবং ২০০৫ সালে মোদিকে ভিসা দিতেও অস্বীকার করেছিল। অথচ জাতীয় পর্যায়ে মোদি/বিজেপি'র উত্থানকে স্বাগত জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। ভারতের কর্পোরেট শাসকশ্রেণির শাসনক্ষমতা পাকাপোক্ত ছাড়াও ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের গুরুত্ব এখানে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পুঁজিবাদী চীনের আধিপত্য বিস্তারোরোধে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন। সাম্রাজ্যবাদ ও দালাল শাসকশ্রেণি ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ইত্যাদির ঢাকঢোল পেটালেও তাদের প্রয়োজনে ধর্মীয় মৌলবাদীদেরকে তারা কোলে তুলে নেয় বিপ্লব, প্রগতি ও গণতন্ত্রকে ধুলিসাৎ করে। আফগানিস্তানে তালেবান সৃষ্টি করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সাম্রাজ্যবাদী এমন প্রয়োজন থেকেই।

ভারতীয় শাসকশ্রেণির ক্ষমতাসীন দল কংগ্রেসের স্থূল গণবিরোধিতাকে পুঁজি করে ক্ষমতা-বহির্ভূত হিন্দুত্ববাদী সংগঠন বিজেপি মাঠে নামে। তারা ধর্মীয় ভাবাবেগকে কাজে লাগাতে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দেয়। বিজেপি তাই দুর্নীতি প্রতিরোধ, উন্নয়ন, পরিবারতন্ত্রকে বিরোধিতার শ্লোগানের সাথে মুসলমান বিরোধী শ্লোগান তোলে। যার মাঝে অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণ, ভারতের পশ্চিমবঙ্গে এবং আসামে 'অনুপ্রবেশকারী' মুসলিমদের বহিস্কার, খুলনা থেকে সিলেট পর্যন্ত সরলরেখা টেনে বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গঠন ও বাংলাদেশ থেকে সেখানে হিন্দু 'অনুপ্রবেশকারী'দের পুনর্বাসন করা এবং ভারতীয় কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদার যে ধারা ভারতীয় সংবিধানে রয়েছে সেটি তুলে নেয়া ইত্যাদি।

উপরোক্ত প্রতারণামূলক শ্লোগান এবং সাম্প্রদায়িকতা ছড়িয়ে হিন্দু জনগণের ধর্মীয় মূল্যবোধকে মোদি ব্যবহার করে তার নির্বাচনী রাজনীতিতে। সাধারণ জনগণ কংগ্রেসকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বিকল্প মনে করে মোদিকে ভোট দিয়েছে। ভোটে জেতার জন্য মোদি যতটা সাম্প্রদায়িক বক্তব্য দিয়েছে, এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ততটাই সংযত আচরণ করছে এবং করতে বাধ্য। মোদি সংখ্যালঘু মুসলিমদের প্রতিনিধি নাজমা হেপাতুল্লাকে তার সরকারের মন্ত্রি বানিয়েছে। এবং সবাইকে নিয়ে সরকার ও দেশ পরিচালনার আশ্বাস দিয়েছে। এমনকি চির শত্রু পাকিস্তানের সাথেও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা পুলক বোধ করছে। ভারত যে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ, তার প্রচার-প্রচারণায় তারা মেতে উঠেছে। এই সবই যে ভড়ং তা মোদি শাসনের কয়েক মাসের মধ্যেই স্বচ্ছ হয়ে যাবে। বিজেপি এবং মোদি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের দালাল এবং ভারতের কর্পোরেট মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের প্রতিনিধি। তাদের স্বার্থ রক্ষাই মোদি সরকারের পরম দায়িত্ব। ভারতীয় সাধারণ জনগণের কোন দুর্গতিরই সমাধান এই সরকার দিতে সক্ষম নয়। কিছুদিনের মধ্যেই মোদি সরকারের চরিত্র জনগণের কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। আপাত মোদি যত সংযত আচরণই করুক না কেন তার আদর্শের বলিয়ান সৈনিকরা তার আদর্শের বহিঃপ্রকাশ ঘটাবেন এটা নিশ্চিত করেই বলা যায়। ইতিমধ্যে একজন মুসলিম যুবককে তার সৈনিকরা পিটিয়ে হত্যা করেছে। মোদির শাসনব্যবস্থা ব্যর্থতার গ্লানি ঢাকতে ভিন্ন কোন সমাধান খুঁজে না পেলে গণবিরোধী সাম্প্রদায়িকতার পথে সমাধান খুঁজার চেষ্টা করলে অবাক হবার কিছু থাকবে না। যা তার নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার। ততদিনে ধর্মনিরপেক্ষতার ছাতা তুলে ধরে কংগ্রেস বিজেপিবিরোধী প্রচারণায় নেমে পড়বে এবং পুনরায় পরবর্তী ভোটে ক্ষমতায় যাবার কোশেশ করে যাবে। এটাই বুর্জোয়া সংকটের বুর্জোয়া সমাধান। জনগণ ওদের মাঝেই ঘুরপাক খাক, আর তাদের মূল ব্যবস্থাটা অব্যাহত থাকুক।

* মোদির নেতৃত্বে বিজেপির ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের শাসক বুর্জোয়াদের মধ্যে জোর আলোচনা-বিতর্ক চলছে– এখন বাংলাদেশের সাথে ভারতের সম্পর্কটা কেমন হবে; কংগ্রেস মদদপুষ্ট আওয়ামী লীগের সাথে বিজেপি'র সম্পর্কটা কেমন হবে ইত্যাদি। আওয়ামী সরকার কি বিজেপি'র কাছে কদর পাবে? নাকি বিএনপি'র কপালে বিজেপি'র আশীর্বাদ জুটবে। এই বিতর্ক বাংলাদেশের শাসকশ্রেণির শাসন ক্ষমতায় থাকা না থাকা বা ক্ষমতায় যাওয়া না যাওয়ার হিসাব-নিকাশ। এতে শ্রমিক-কৃষক সাধারণ জনগণের কোন স্বার্থ নেই।

ভারত হচ্ছে একটি প্রতিক্রিয়াশীল সম্প্রসারণবাদী রাষ্ট্র। বুর্জোয়া শাসকদের অভ্যন্তরে ক্ষমতার হাত বদল হলেও তার চরিত্র কখনই বদলায়নি। সীমান্ত সংলগ্ন দেশগুলোর উপর তার আধিপত্য বিস্তার, বাজার দখল, অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে নেয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো অব্যাহত রাখতে বা আরো বেশী মজবুত করতে তার আগ্রাসী তৎপরতা থাকবেই। এ জন্যে সীমান্তে হত্যা চলবে। ইতিমধ্যে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে জঙ্গীবাদের আস্তানার অভিযোগ তুলে বিএসএফ-কে পুনরায় প্রাণঘাতি অস্ত্র (লিথ্যাল উইপন) দেয়ার চিন্তা চলছে। টিপাইমুখ বাঁধ নির্মাণ বন্ধ হবে না। সীমান্ত সমস্যার সম্মানজনক সমাধান হবে না। তিস্তার পানি চুক্তি হবে কি হবে না তার চেয়েও বড় কথা হলো তিস্তায় পানি আসবে না। গঙ্গা চুক্তিওতো হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশী পদ্মায় আজ শুকনা মৌসুমে গরু চরে। করিডোর ভারতকে দিতে হবে। রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র করতে হবে। নতুবা তারা সরকার ফেলে দেবে– সে আওয়ামী লীগই হোক, আর বিএনপিই হোক। সেজন্য অবশ্য এই পার্টি দুটোর বড় একটা মাথা ব্যথা নেই। ক্ষমতায় থাকা বা যাবার জন্য যতটুকু দালালী বা নতজানু হতে হয় তারা হতে প্রস্তুত। শুধু নিশ্চয়তা দরকার ভারত একাজে কাকে ভাল মনে করছে। তাই, এই ক্ষমতালোভী বুর্জোয়া দলগুলো মোদি সরকারের পদলেহন করতে প্রতিযোগীতায় নেমে পড়েছে। যেহেতু কংগ্রেসের সাথে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক খাতির রয়েছে এবং ৫ জানুয়ারীর প্রহসনের মধ্য দিয়ে খোদ কংগ্রেস ও তার সরকার আওয়ামী লীগকে হাত ধরে ক্ষমতায় বসিয়েছে তাই বিরোধী বিজেপি'র বিষয়ে আওয়ামী লীগের কিছুটা শংকা স্বাভাবিক। আর সেখানেই বিএনপি'র প্রত্যাশা। কিন্তু দেশ বা জনগণের পাবার বা হারাবার নতুন কিছু নেই।

তবে প্রকাশ্যে ধর্মবাদী দল বিজেপি (বিশেষত তার মূল শক্তি সংঘ পরিবার)-কে ভারতীয় শাসকশ্রেণি ক্ষমতায় আনায় শুধু ভারত নয়, বাংলাদেশসহ পুরো দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির আরো অবনতির আশংকা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বাংলাদেশে ধর্মীয় জঙ্গিবাদ বিকাশের সম্ভাবনাও বাড়বে। এ সম্পর্কে অবশ্যই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে সতর্ক থাকতে হবে। কিন্তু সেটা করতে হলে ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশধারী জনগণবিরোধী কংগ্রেস ও তার পেয়ারা আওয়ামী লীগ ও তার তস্য দালাল তথাকথিত বামদের মুখোশ উন্মোচনকেও দায়িত্ব হিসেবে পালন করতে হবে। সর্বোপরি ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের চরিত্র উন্মোচনে ও তার বিরোধিতায় পরিপূর্ণ সক্রিয় থাকতে হবে। শুধুমাত্র জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচিই জনগণকে সেদিকে পরিচালিত করতে পারে। ❐

আমেরিকা-রাশিয়া তথা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বব্যবস্থাই ইউক্রেন সমস্যার মূল কারণ

লেনিন বলেছেন– সাম্রাজ্যবাদ মানেই যুদ্ধ। ইরাক-আফগানিস্তান-লিবিয়া-সিরিয়ার পর এখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইউক্রেন নিয়ে রাশিয়ার সাথে মুখোমুখি অবস্থানে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়ার পর সেগুলোকে মদদ দিয়ে আমেরিকা এককালীন তার প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়াকে চাপে রেখে আসছে। রাশিয়া থেকে বিভক্ত হওয়া রাষ্ট্রগুলোর একটি ইউক্রেনের ক্রিমিয়া উপদ্বীপ গত মার্চে গণভোটের মাধ্যমে রুশ ফেডারেশনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তারপরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্ষেপে গিয়ে জি-৮ থেকে রাশিয়াকে বহিস্কার করে।

অতিসম্প্রতি আবার রাশিয়ার সীমান্তবর্তী দোলেতাক ও লুহানস্ক প্রজাতন্ত্র রুশ ফেডারেশনে যোগদানের ঘোষণা দিয়েছে। এই দুই প্রজাতন্ত্রের বেশীর ভাগ মানুষ ১০ মে অনুষ্ঠিত এক গণভোটের মাধ্যমে স্বাধীনতার পক্ষে রায় দিয়েছে। ফলে জি-৮ থেকে রাশিয়াকে বহিস্কারের পর অনুষ্ঠিত জি-৭-এর সরকার প্রধানরা প্রথম বৈঠকে মস্কোর উপর অর্থনৈতিক অবরোধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুধু তাই নয়, রাশিয়াকে মোকাবেলা করার জন্য আমেরিকা ইউরোপে তার সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি করেছে প্রায় ১ বিলিয়ন ডলারেরও(প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা) বেশী।

অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের সহযোগিতায় ইউক্রেনে আরেকটি নির্বাচনের মাধ্যমে পেতোপোরোসেনকোকে নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেছে। কিন্তু বিদ্রোহী দুই প্রজাতন্ত্র এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। এখন ইউক্রেনের সেনাবাহিনী এবং রাশিয়া সমর্থিত গেরিলা বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যকার দ্বন্দ্বে আপাতঃ কোনঠাসা রাশিয়া বলছে– ইউক্রেনে রুশপন্থীরা নিজেরাই বিদ্রোহ করছে, যার উপর মস্কোর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

ইউক্রেনের ঘটনা প্রবাহে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নিজের থুথু নিজের মুখে পড়েছে। আমেরিকা এতদিন তার প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভাঙ্গনের জন্য ছোট ছোট জাতি-রাষ্ট্রকে উগ্র জাতীয়তাবাদে মদদ দিয়েছে। আর এখন তারই অনুগত ইউক্রেন ভেঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হচ্ছে, যাকে আবার রাশিয়া মদদ দিচ্ছে। তখনই দু'পক্ষের তীব্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছে। উগ্র জাতীয়তাবাদ-সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী সমস্যা হচ্ছে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের অভ্যন্তরীন সংকট-সমস্যা। যদিও ওখানকার জনগণ তার শিকার হচ্ছেন। এ দ্বন্দ্ব অমীমাংসেয়। ইউক্রেনের সমস্যাকে পুঁজি করে আমেরিকা তার প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়াকে কোনঠাসা করতে চায়, আর রাশিয়া তার প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকাকে ইউক্রেনসহ ইউরোপ থেকে বিতাড়িত করতে চায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন– ১৯১৭ সালে লেনিন-স্ট্যালিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হওয়ার পর ইউক্রেনসহ অনেক ছোট ছোট জাতি-রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে সম্মিলিতভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। জাতিসমূহের কারাগার পুঁজিবাদী জার শাসিত রাশিয়াকে কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতা দখল করার পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারসহ স্বায়ত্তশাসন– এই লেনিননবাদী নীতিমালার ভিত্তিতে শুধু জাতীয় নিপীড়ন নয়, মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণ ক্রমান্বয়ে বন্ধ করে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিলো। এমনকি ফিনল্যান্ড আগে জার শাসিত রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত থাকলেও লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন ফিনল্যান্ডের জনগণের ইচ্ছার ভিত্তিতে তাকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের সুযোগও দিয়েছিল।

কিন্তু সেই সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে লেনিন-স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর নেতৃত্বে আসে ক্রুশ্চেভ-ব্রেজনেভ। ক্রুশ্চেভের নেতৃত্বে সংশোধনবাদীরা (নামে সমাজতন্ত্র, কাজে পুঁজিবাদ) সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করে। যা চলে প্রায় ৩০ বছর। যাকে বলা হয় সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া। স্বাভাবিকভাবেই জনগণ অসন্তুষ্ট হয়, বিদ্রোহ করে, সংশোধনবাদের শেষ অনুসারী গর্বাচভের পতন ঘটে। এই ভুয়া সমাজতন্ত্র, তথা সংশোধনবাদের পতনকে সাম্রাজ্যবাদীরা সমাজতন্ত্রের পতন বলে অপপ্রচার করে সমাজতন্ত্র মৃত বলে ঘোষণা দেয়। জনগণ বিভ্রান্ত হন।

প্রকৃত সত্য হচ্ছে– সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার যে দ্বন্দ্ব ছিল সেটা পরিবর্তিত হয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বনাম রাশিয়ান সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বে পরিণত হয়েছিল। এই দ্বন্দ্বে আমেরিকা তার প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়াকে হটিয়ে এক পর্যায়ে ('৯০-দশকে) এক-মেরু বিশ্ব ব্যবস্থা কায়েম করেছিল। কিন্তু রাশিয়ান সাম্রাজ্যবাদ পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করছে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা বহুবিধ সংকটের আবর্তে জড়িয়ে পড়ছে। এ অবস্থায় রাশিয়া তার প্রভাব পশ্চিমে বিস্তৃত করার উদ্যোগ নিয়েছে। আমেরিকা চাচ্ছে সেটা পূর্বের মত রক্ষা করতে। এটাই এখানকার বর্তমান দ্বন্দ্বের মূল বিষয়। জনগণ স্বাধীনতা জাতীয়তাবাদের নামে এই উভয় গণশত্রু শক্তির দাবার বোড়ে হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছেন।

জাতীয়তাবাদ এই জনগণকে মুক্তি দিতে পারে না। কেবলমাত্র আর একটি সত্যিকার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ইউক্রেনসহ অন্যান্য জাতি সমস্যা তথা রাশিয়ার জনগণের সমস্যার সমাধান করতে পারে। সেজন্য বিগত রুশ বিপ্লব ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভুল ত্রুটি সীমাবদ্ধতা সারসংকলন করে এগিয়ে যেতে হবে। এছাড়া ইউক্রেন-রাশিয়ার জনগণের মুক্তির অন্য কোন পথ নেই। ❐

ভারতের লোকসভা

॥ শেষের পৃষ্ঠার পর ॥

প্রদেশে গড়ে ওঠা মাওবাদী তৎপরতায় ভারতীয় শাসকরা আজ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং মাওবাদীদেরকে অভ্যন্তরীন প্রধান বিপদ হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিল। '৬০-এর দশকের শেষ লগ্নে গড়ে ওঠা এ সংগ্রামকে মাওবাদীরা শ্রমিক-কৃষক, অবহেলিত আদিবাসী জনতার ও নিপীড়িত জাতি-জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই বলেই ঘোষণা করছে। ❐

ভারতে গণতান্ত্রিক

॥ শেষের পৃষ্ঠার পর ॥

ভারতে বা তৃতীয় বিশ্বে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলোতে গণতান্ত্রিক কর্মী, বুদ্ধিজীবী, মানবাধিকার কর্মী, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক নেতা-কর্মীদের উপর রাষ্ট্রের এই বর্বরতা নতুন কিছুই নয়। ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের বিকাশের ফলে এই দমন-নিপীড়ন বর্তমানে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। ভারতের লেখিকা অরুন্ধতী রায়সহ প্রগতিশীল শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, মানবাধিকারকর্মী এবং ডিইউটিএ সাইবাবার এ গ্রেপ্তারকে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এবং অবিলম্বে তাঁর মুক্তি দাবী করেছে। বাংলাদেশেও কিছু গণতান্ত্রিক সংগঠন (জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলসহ) এ গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানিয়ে তার মুক্তি দাবী করেছে। আমরা সকল গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল সংগঠন, শক্তি, বুদ্ধিজীবী ও মানবাধিকার কর্মীদের ভারত রাষ্ট্রের এহেন ফ্যাসিষ্ট-বর্বরোচিত কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এবং ভারতের মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মুখোশ উন্মোচনে সক্রিয় হতে আহ্বান জানাচ্ছি। ❐

শোক সংবাদ

কমরেড সোবাহান ১৭ মার্চ '১৪ রাত ৯টায় ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৪৮ বছর। প্রথমে তার গলায় টিউমার হয়। টিউমার অপারেশনের কিছু দিন পর ক্যান্সার ধরা পড়ে এবং চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় ভূমিহীন-গরীব পরিবারের চিকিৎসা যে অপ্রতুল তা বলাই বাহুল্য।

কমরেড সোবাহান শরীয়তপুর জেলার সদর থানার মাহমুদপুর গ্রামের এক গরীব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালেও তিনি সর্বহারা শ্রমিকই ছিলেন। ১৯৮৮ সালে আগারগাঁও বিএনপি বস্তিতে থাকাকালীন বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের আদর্শে বিশ্বাস স্থাপন করেন। '৯১ সালে খালেদা জিয়ার রিক্সা উচ্ছেদ, ভিআইপি রোডের প্রতিবাদে আন্দোলন করেন এবং বস্তি উচ্ছেদ প্রতিরোধ আন্দোলন করেন।

তবে '৯২/'৯৩ সালের দিকে এসে তিনি আংশিকভাবে মতাদর্শগতভাবে বিচ্যুত হন এবং এনজিও, বাসদ, এনডিএফ ইত্যাদি সংগঠনের সাথে বছরখানেক ঘুরেন। কিন্তু বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের রাজনৈতিক-মতাদর্শগত সংগ্রামের ফলে তিনি পুনরায় '৯৪ সালে বিঃ শ্রঃ আঃ-এ যুক্ত হন। দীর্ঘ বছর তিনি বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের কর্মী হিসেবে কাজ করেন। কিন্তু ২০০৯ সালে স্থানীয় সংগঠকের উপর কিছু অভিযোগ তুলে ভিন্ন একটি মাওবাদী সংগঠনে যুক্ত হন, মূলতঃ নিষ্ক্রিয় থাকেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে উক্ত সংগঠকের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে তিনি সংগঠনের সাথে সংযোগ ও কাগজপত্র পড়তে চান। ভুল-বিচ্যুতিসহ কমরেড সোবাহান মাওবাদের আদর্শের ও সমাজতন্ত্র-কমিউনিজমের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। তার মৃত্যুতে আমরা মর্মাহত এবং তার শোকাহত পরিবারের প্রতি জানাচ্ছি সমবেদনা।

বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের মহানগর কমিটির সভায় কমরেড সোবাহানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। ❐

মিরপুরে বিহারী ক্যাম্পে

॥ প্রথম পৃষ্ঠার পর ॥

কেডাররা। সরকারি জমিতে বস্তি করে সেখান থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা তারা ভাড়া তোলে, যার ভাগ পুলিশ ও প্রশাসনের লোকেরাসহ ক্ষমতাসীন সবাই পায়। এখন সেখানে বিদ্যুৎ দেয়ার জন্য বিহারী ক্যাম্প থেকে বিনা পয়সায় লাইন নেয়াকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন আগেই খোদ এমপি'র সাথে বিহারীদের দ্বন্দ্ব হয়। তারই ফলশ্রুতিতে বিহারীদের শায়েস্তা করার জন্য সবেবরাতের আতশবাজির সুযোগ গ্রহণ করে বিহারীদের বিরুদ্ধে স্থানীয় কিছু বাঙালিকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে দাঙ্গার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এই বর্বর হত্যাকান্ড ঘটানো হয়।

তদুপরি বিহারী ক্যাম্পের জমির উপর এই আওয়ামী গডফাদারদের রয়েছে লোভনীয় দৃষ্টি। কালশী রোডে আওয়ামী নেতারা দোকান করার জন্য বিহারীদের উপর চাপ সৃষ্টি করছিল। তাছাড়া বিহারী-বাঙালি দাঙ্গা বাধিয়ে শেষ পর্যন্ত রাজাকার অপবাদ দিয়ে বিহারী ক্যাম্প উচ্ছেদ ও তা দখলও তাদের লক্ষের মধ্যে রয়েছে।

সরকার তদন্ত ও বিচারের কথা বললেও এখন পর্যন্ত (২৩/০৬/১৩) এই ঘটনার সাথে যুক্ত কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। বরং ঘটনার পর পর বিহারীদের গ্রেপ্তার করেছে এবং বিহারী ক্যাম্প ঘিরে রেখে বিহারীদেরই গ্রেপ্তার আতঙ্কে রেখেছে। তারা মর্মান্তিক এ ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য বিহারীদের অভ্যন্তরিণ কোন্দল বলে প্রচার করে